ASIAN HUMAN RIGHTS COMMISSION
19 Floor, Go-Up Commercial Building, 998 Canton Road
Kowloon, Hong Kong . Tel: +(852) 2698-6339 . Fax: +(852) 2698-6367
E-mail: ahrchk@ahrchk.org . Web: www.ahrchk.net

অতি সত্ত্বর প্রকাশের জন্য
৭ আগষ্ট ২০০৬
এএইচআরসি-ওএল-০৪০-২০০৬

জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলের প্রতি এশিয়ান হিউম্যান রাইটস্ কমিশনের খোলা চিঠি

লুইস আলফোনসো ডি আল্বা
সভাপতি
জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিল
ওএইচসিএইচআর-ইউএনওজি
৮-১৪ এভেনিউ ডি লা পাইক্স
১২১১ জেনেভা ১০
সুইজারল্যান্ড

ফ্যাক্স: +৪১ ২২ ৯১৭৯০১২

প্রিয় জনাব ডি আল্বা,

বাংলাদেশ: বিচার বহির্ভুত হত্যা বন্ধে ব্যর্থতা বাংলাদেশকে জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের জন্য অনুপযোগী করে তুলছে

এটা হচ্ছে পাঁচটি চিঠির তৃতীয় চিঠি যা এশিয়ান হিউম্যান রাইটস্ কমিশন (এএইচআরসি) বাংলাদেশের ভয়াবহ মানবাধিকার পরিস্থিতি এবং এর কারণসমূহের বিষয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে আপনার মাধ্যমে জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলকে লিখতে বাধ্য হচ্ছে। আমরা এটা করছি, যদি বাংলাদেশ সদস্য হিসেবে আসন্ন তিন বছরের জন্য থাকার অনুমতি পায় যেমনটা তারা চেয়েছে, এবং যেহেতু কাউন্সিলের মর্যাদা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন, সে কারনে।

এই প্রথম চিঠিতে আমরা আলোকপাত করেছিলাম ১৫ বছর ধরে অঙ্গীকার করা সত্ত্বেও বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথকীকরণে বাংলাদেশ সরকারের ব্যর্থতা এবং ফলশ্রুতিতে সেখানে অধিকার লংঘনের শিকার ভিক্টিমদের প্রতিকার অস্বীকৃত হওয়ার বিষয়ে। দ্বিতীয় চিঠিতে আমরা নির্যাতনকে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করে আইন প্রণয়নে সরকারের ব্যর্থতা এবং বাংলাদেশে পুলিশ ও অপরাপর নিরাপত্তা বাহিনী দ্বারা নির্যাতন ও নিষ্ঠুর ও অমানুষিক আচরণের শিকার ভিক্টিমদের উপর চাপিয়ে দেওয়া অপ্রয়োজনীয় ভোগান্তি সম্পর্কে তুলে ধরেছিলাম।

আমাদের তৃতীয় চিঠিতে বাংলাদেশ জুড়ে পুলিশ এবং বিশেষ আধাসামরিক বাহিনী'র ইউনিটগুলো দ্বারা অপ্রতিরোধ্যভাবে চলমান বিচার বহির্ভুত হত্যা, এবং হত্যাকারী রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের দায়মুক্তি দেওয়ার প্রথা সম্পর্কে তুলে ধরতে চাই।

আমাদের পূর্ববর্তি চিঠিতে যেমন উল্লেখ করা হয়েছিল যে, জাতিসংঘের কাছে বাংলাদেশ সরকার আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মানবাধিকার চুক্তিতে স্বাক্ষর করা নিয়ে যথেষ্ট বাগাড়ম্বর করেছিল। সেগুলোর মধ্যে প্রথমেই ছিল সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত চুক্তি (কভেন্যান্ট অন সিভিল এ্যান্ড পলিটিক্যাল রাইটস্) এর কথা। এই চুক্তিতে সংরক্ষিত অধিকারসমূহের মধ্যে জীবনধারণের অধিকারের চেয়ে মূল্যবান আর কোন অধিকার নেই: যেক্ষেত্রে, বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীগুলো কোন প্রকার ফলাফলের তোয়াক্কা না করেই ক্রমবর্ধমান হারে মানুষকে হত্যা করে

দেশজুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে দিয়েছে। সরকার তাদের পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সম্মতি-ভীতি ছাড়াই এসব হত্যার সুস্পষ্ট অনুমোদন, উৎসাহ দিয়েছে এবং তা গ্রহন করেছে।

২০০২ সালে বাংলাদেশ সরকার কুখ্যাত অপারেশন ক্লীন হার্ট চালু করেছিল। অপরাধের মূলোৎপাটনের সম্ভাবনার কথা বলা হলেও সেই অপারেশন হাজার হাজার দরিদ্র ও নিরপরাধ মানুষের গ্রেপ্তার, এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ে অনেক হত্যা সংঘটিত করেছিল- তার পর থেকে দেশজুড়ে মানুষের কাছে এমন লোমহর্ষক হত্যার ঘটনা "ক্রসফায়ার" বলে পরিচিতি পেয়ে আসছে। এই অভিধানটি ব্যবহৃত হয়েছিল বিচার বহির্ভূত হত্যার ঘটনাগুলোকে বর্ণনা করার জন্য- যা পুলিশ বা অন্যান্য বাহিনীগুলো সশস্ত্র অপরাধী এবং অন্যদের সাথে পারস্পরিক (গুলি) বিনিময়ের ফলে সংঘটিত হত্যা দেখানোর জন্য। ২০০৩ সালে সরকার "ক্লীন হার্ট" অভিযানে হত্যা, পিটুনী, বেআইনী গ্রেপ্তারের জন্য দায়ী পুলিশ এবং অপরাপর রাষ্ট্রীয় বাহিনীর সবাইকে পূর্ণাঙ্গ দায়মুক্তি দিয়েছিল- এটা এমনই একটি ঘটনা যে, জাতিসংঘের বিচার বহির্ভূত হত্যা, সংক্ষিপ্ত বা নিবর্তনমূলক মৃত্যুদন্ড বিষয়ক বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তা এর তীব্র নিন্দা করেছিলেন। ২০০৪ সাল নাগাদ, সেই অপারেশন র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন নামে সেনা ও পুলিশের সমন্বিত একটি আধা-সামরিক বাহিনীর জন্ম দিল। " র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন" নামটিই এখন "ক্রসফায়ার" এর সমার্থক শব্দে রূপান্তরিত হয়েছেঃ রাজনৈতিক প্রভুদের আজ্ঞাবহ হওয়া ছাড়া সারা দেশে মোতায়েনকৃত এর বিভিন্ন ইউনিটের কর্মতালিকায় আর কোন কাজ নেই। যেখানেই তারা যাক না কেন হত্যা ও জখম করা, বেআইনীভাবে কারাগারে নিক্ষেপ এবং ভীতি ছড়িয়ে দেয়।

হারুন-উর-রশিদ এবং আসলাম হোসেনের কথা ধরুন, যারা ১৪ জুলাই ২০০৬ ঢাকা থেকে র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়নের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছিল। পরে তাদেরকে যশোরস্থ অন্য একটি ইউনিটের কাছে হস্তান্তর করা হয়, এবং ১৬ জুলাই "ক্রসফায়ারে" তারা নিহত হয়। এক সর্বজনবিদিত গল্প অনুযায়ী, সংশ্লিষ্ট ইউনিট প্রচার করল যে, উক্ত দুই ব্যক্তি শহরের বাইরে কোন এক স্থানে বেআইনী আগ্নেয়াস্ত্র রাখার কথা স্বীকার করেছিল। ১৬ জুলাই ভোর রাতে তাদেরকে পৃথক দু'টি স্থানে অস্ত্র উদ্ধারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হল, যেখানে পৃথক দু'টি ঘটনায় উক্ত দুই ব্যক্তির সহযোগীরা গুলি চালানোর জবাবে গুলি ছোঁড়ার সময় আটককৃতরা পালিয়ে যাবার চেষ্টা করলে "এনকাউন্টারে" নিহত হয়। অপর একটি সুত্র এমনও অভিযোগ করেছে যে, ব্যাটালিয়ন সদস্যরা আটককৃত দুই ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনদের সাথে তাদের জীবন রক্ষার বিনিময়ে দর কষাকষি করার পর চাহিদা অনুযায়ী পরিবারগুলো অর্থদিতে অপারগ হওয়ায় বা অস্বীকৃতি জানানোয় অবশেষে তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে।

কোন প্রকার প্রতিকারের বা অভিযোগের সুযোগদান ছাড়াই অসংখ্য হত্যা সংঘটিত হয়েছে, একই প্রক্রিয়ায়ঃ গ্রেপ্তার, অবৈধ অস্ত্র সম্পর্কে বা নির্দিষ্ট স্থানে অন্য কোন অপকর্মের "তথ্য" প্রাপ্তি; সেই জায়গায় গমন; অপরাধী বা চরমপন্থীদের সাক্ষাত লাভ; ভিক্টিমের পলায়ন প্রবণতা এবং অবধারিতভাবে "ক্রসফায়ারে" তার মৃত্যু। নিদর্শনস্বরূপ কয়েকটি অস্ত্র বা অন্যান্য প্রমাণ "উদ্ধার" করা হয় ঘটনাটি প্রমাণের জন্য। এভাবেই গল্পের সমাপ্তি ঘটে।

র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন কার্যকর করে বাংলাদেশের সরকার এটা স্বীকার করে নিয়েছে যে, তাদের প্রশাসনের অধীনে, আইনের শাসন- অতীতে এর অস্তিত্ব যতটুকুই থেকে থাকুক, তা- একেবারেই ভেঙে পড়েছে। কিন্তু, বিপরীতে এই ভেঙে পড়ার কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা এবং প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যাগুলো গুরুত্বসহকারে সমাধানের চেষ্টা না করে আইনহীনতা মোকাবেলায় রাষ্ট্র নিজেই আইনহীন পথ বেছে নিয়েছে। ফলশ্রুতিতে, বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্যে জুটছে আরও বেশী হত্যা ও আরও বেশী দুর্দশা, এবং সেখানে আইনের শাসন ও মানবাধিকার প্রত্যাশা বা এসবের প্রতি জনসাধারণের আস্থা আরও অতলে তলিয়ে যাচ্ছে।

এএইচআরসি অত্যন্ত সন্দিহান যে, আন্তর্জাতিক সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত চুক্তির সাথে সংগতি রেখে জীবণ ধারণের অধিকারকে উপরে তুলে ধরার প্রতি বাংলাদেশ সরকারের আদৌ কোন ইতিবাচক অঙ্গিকার আছে কি-না। যদি তাদের এমন কোন ইচ্ছা থাকতো, তাহলে ২০০২ সালে চরম অপপ্রয়োগের হোতাদের দায়মুক্তি দেওয়ার মত অপকর্ম করতো না। তারা কুখ্যাত অপারেশন ক্লীন হার্টের অনুকরণে র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন গঠন করত না, যারা বিভ্রান্তি ও অনাচার ছড়িয়ে দিয়েছে এবং অবলীলায় দেশের নিয়মিত সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর সাথে হত্যার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছে। ফলে, হারুন-উর-রশিদ ও আসলাম হোসেনের মত অগণিত সংখ্যক ভিক্টিম প্রতিদিনই হত্যার শিকার হত না, যাদের পরিবারগুলো বিচারের জন্য সংগ্রাম করা তো দূরের কথা, হয়ে পড়েছে ভীত-সন্ত্রস্ত; এবং হত্যা সম্পর্কে অভিযোগ

আনতেও তারা নিস্পৃহ। তারা জানে, নিপীড়নকারীদের শক্তি সম্পর্কে এবং নির্বাহী নিয়ন্ত্রনাধীন আজ্ঞাবহ বিচার বিভাগ থেকে কোন প্রতিকারই মিলবে না।

বাংলাদেশ সরকার অঙ্গীকার করেছে যে, তারা "কাউন্সিলের মেয়াদকালে সর্বজনীন মেয়াদী পর্যালোচনা প্রক্রিয়া (ইউনিভার্সাল পিরিওডিক রিভিউ মেকানিজম) এর অধীনে পর্যালোচনা (রিভিউ)'র মুখোমুখী হতে সদা প্রস্তুত থাকবে"। এশিয়ান হিউম্যান রাইটস্ কমিশন তৃতীয় বারের মত কাউন্সিলকে উক্ত অঙ্গীকারটি স্মরণ করতে এবং কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থা পর্যালোচনার জন্য যত শীঘ্র তা সুনিশ্চিতভাবে করা যায়, করতে আহ্বান জানাচ্ছে। ছেলে খেলার মত চলমান বিচার বহির্ভুত হত্যা- যা আসলে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, প্রতিকারে বাংলাদেশ সরকারের ব্যর্থতা, একেবারেই অমার্জনীয়। এটা প্রতিদিনই বাংলাদেশের মানুষের দূর্ভোগ সৃষ্টি করছে এবং দেশের পুলিশী কার্যক্রম ও প্রশাসনের অন্যান্য সকল ক্ষেত্র এবং ন্যায় বিচারের প্রতি তাদের আস্থাকে সর্বোতভাবে কুরে কুরে খাচ্ছে। এটা কোন রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য হতে পারে না, যারা মানবাধিকারের প্রতি তাদের অঙ্গিকারের জন্য প্রশংসিত হওয়ার যোগ্য; বরং এটা মানবাধিকারের নামে ধোঁকাবাজিতে লিপ্ত একটি দেশের বৈশিষ্ট্য। বাংলাদেশের মানুষ এর সবই জানে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের এই সত্যের সাথেই জেগে ওঠার এটাই সময়।

আমি অনুরোধ করবো যে, আপনার দপ্তর এই চিঠিকে কাউন্সিলের সকল সদস্যদের বিবেচনার জন্য পৌছে দেয়া হোক।

আপনার বিশ্বস্ত

বাসিল ফার্নান্ডো
নির্বাহী পরিচালক
এশিয়ান হিউম্যান রাইটস্ কমিশন, হংকং।

অনুলিপিঃ
১। জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের সকল সদস্য রাষ্ট্রের স্থায়ী প্রতিনিধিবৃন্দ, জেনেভা।
২। জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের সকল সদস্য রাষ্ট্রের দূতাবাসসমূহ, বাংলাদেশ।